দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 12 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষার লক্ষ্যে

হাসান মোস্তাফিজুর রহমান

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও কোনো তোয়াক্কা না করে শুরু হয়ে গেছে এ পদ্ধতি। নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা চরম আতঙ্ক নিয়ে বাধ্য হয়েই শুরু করে দিয়েছে তাদের লেখাপড়া। এতদিন তারা যে নির্দেশিত পথে পড়াশোনা করে এসেছে, যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়েছে হঠাৎ করেই যেন বা রাতারাতি পাল্টে গেছে তা। সদ্য ক্লাস নাইনে ওঠা কোমলমতী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে নতুন এ পদ্ধতি চালু হবে। ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মহল- এদের সম্মিলিত আপত্তি বা প্রতিবাদে টলেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকেই পদ্ধতিটি চালু করতে চেয়েছিলো তারা। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে যায়। ফলে স্থগিত করে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন চালুর সিদ্ধান্ত। কিন্তু এবার তারা সিদ্ধান্তে অটল। বই সেই আগেরই, অনুশীলনীও একই রকম প্রশিক্ষণও হয়নি বেশীরভাগ শিক্ষকের- প্রকট এ সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খ্যাতিমান শিক্ষকসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বোদ্ধারা একবাক্যে বলেছেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জোয়াল হঠাৎ করে এসব শিক্ষার্থীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া একেবারেই অনুচিত হবে, এ পদ্ধতি চালু করতে হলে ক্লাস সিক্স থেকেই চালু করা উচিত, যাতে নতুন এ পদ্ধতিতে তারা আগ থেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে তারা কানে দিয়েছেন তুলা, পিটে বেঁধেছেন কুলা!

এর আগে একমুখী শিক্ষা জোড়াতালি এবং তড়িঘড়ি করে চালু করার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয় দেশজুড়ে। জোট সরকার একমুখী শিক্ষা চালুর বিষয়টি স্থগিত করে দেয় ২০০৬ সালে। পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের বিষয়টি এই একই প্রকল্পের অংশ হিসেবে এসেছে। উল্লেখ, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো সেই ১৯৯৯ সালে। এডিবি'র শতকরা ৭০ ভাগ ও সরকারের শতকরা ৩০ ভাগ অনুপাতে যৌথভাবে ৫১০ কোটি টাকার তহবিলে ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ করে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি শেষ হলেও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু অবকাঠামো ছাড়া আর কোনো সুফল আসেনি। অধিকন্তু ওই প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আরো ৭৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এডিবি ও সরকার যৌথভাবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা সংস্কার নিয়ে বোধ করি কারোই দ্বিমত নেই। এ কারণেই হাতে নেয়া হয়েছিলো ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। এ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিলো একমুখী শিক্ষা চালু, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ এবং পাঠ্যবই বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া। এ তিনটি কাজের ধারাবাহিকতায় পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের কথা ছিলো। কিন্তু একমুখী শিক্ষা এবং পাঠ্য বইয়ের বিষয়টি সমাধান না করেই পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হলো। লক্ষ্য ছিলো মুখস্থবিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করে কোচিং, টিউশনি এবং নোট বা গাইডনির্ভরতা দূরীকরণ বা কমিয়ে আনা। শিক্ষার্থীদের মুখস্তনির্ভর জ্ঞান থেকে বের করে এনে তাদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার দিকে আনা। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হলেও প্রশ্নের ধরন জানা এবং কিভাবে উত্তর লিখতে হবে তা শেখার সুযোগ পায়নি শিক্ষার্থীরা। যে শিক্ষকরা পড়াবেন তারাও পাননি ঠিকমতো প্রশিক্ষণ। এ অবস্থায় এ পদ্ধতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি বাস্তবায়ন করা সম্ভব! আদৌ সম্ভব হলে তা শতকরা কতভাগ? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে।

সিদ্ধান্ত ছিলো পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের আগেই সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলা হবে শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু মাত্র ৬ মাসে প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষককে কি এ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব? উপায় না দেখে শেষমেশ দেশের সাড়ে ১৮ হাজার মাধ্যমিক স্কুল থেকে ৬ জন করে শিক্ষককে ২ দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু মাত্র ২ দিনের প্রশিক্ষণ পাওয়া এসব শিক্ষক নিজেদের স্কুলে গিয়ে বাকি শিক্ষকদের কি প্রশিক্ষণ দেবেন! এমন একটি নতুন পদ্ধতির জন্য মাত্র ২ দিনের প্রশিক্ষণ! বিশ্বের কোথাও কি এ নজির আছে?

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন নামের নতুন এ পদ্ধতিতে চারটি অংশ থাকবে একটি প্রশ্নে ক, খ, গ ও ঘ। এভাবে যাচাই করা হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান স্তর, অনুধাবন স্তর, প্রয়োগ স্তর ও উচ্চতর দক্ষতা। মানবন্টন হবে যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪। কিন্তু পাঠ্য বইয়ের আদৌ সংস্কার না হওয়ার কারণে এ উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বই সেই আগের, অনুশীলনীও আগের মতো। পার্থক্য শুধু এটুকু- প্রতিটি বইয়ের পেছনে নমুনা প্রশ্ন জুড়ে দেয়া হয়েছে। নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলন তথা গদ্য বইয়ের একটি নমুনা প্রশ্নের 'খ'তে বলা হয়েছে, 'উপরিউক্ত অনুচ্ছেদের আলোকে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করো।' কিন্তু ওই অনুচ্ছেদে ছোটগল্পের ব্যাপারে প্রায় কিছুই বলা হয়নি বলা চলে। যা বলা হয়েছে তা থেকে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া দেশের ক'জন শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব? শিক্ষার্থী তো বটেই, দেশের ক'জন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব- এ প্রশ্ন ওঠাও অবান্তর নয়। উল্লেখিত বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প 'ছুটি'। শুধু এ গল্পটি পড়েই শিক্ষার্থী বা শিক্ষক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে ঠিক কতোটুকু কি বুঝতে পারবে! অথচ এ বইয়ে ছোটগল্পের উপর কোনো প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা বিস্তর আলোচনা যুক্ত করা হলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের এ ব্যাপারে কোনো সমস্যাই হতো না। এভাবে আরো নানা উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। শুধু এ বইই নয়, প্রতিটি বইয়েই রয়েছে এ ধরনের অসঙ্গতি। বইয়ের শেষে নমুনা প্রশ্ন আছে। কিন্তু বইয়ের ভেতর এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই। এই যদি হয় অবস্থা, শিক্ষার্থীরা মুখস্থবিদ্যায় নিরুৎসাহিত হবে কিভাবে! কোচিং, টিউশন এবং নোট বা গাইডনির্ভরতা কিভাবে কমবে! কিভাবেই বা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতির লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে?

আসলে নতুন পদ্ধতির নামে শুধু খোলস পাল্টালেই চলবে না, একেবারে খোল-নলচে পাল্টে ফেলতে হবে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার। আমরা যদি সত্যি বিশ্বাস করে থাকি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, তাহলে এ মেরুদণ্ডকে অতি দ্রুত সংস্কার করে সুস্থ, সবল ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে জাতি কুঁজো হয়ে যেতে বা মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে বাধ্য। কোটি কোটি টাকা খরচ করে, ঋণ নিয়ে বারবার পদ্ধতি পাল্টালেই জাতির এ দুর্বল মেরুদণ্ড সবল হবে না। একে সবল করতে প্রয়োজন যথার্থ দাওয়াই।

বলা যায়, এখনো সেই সনাতনী আমলের সিলেবাসেই চলছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। অতিদ্রুত সংস্কার করতে হবে এর। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক এবং যুগোপযোগী বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সিলেবাস, পাঠ্যবইয়ে।

সবাইকে দিয়ে সবকাজ সম্ভব নয়। সবাইই যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানী হতে পারবে, এমন কোনো কথা নেই। যার মেধা আছে সেই পারবে। এবং একথাও সত্য, আমাদের যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানী প্রয়োজন, তেমনি কেরানীও প্রয়োজন। অতএব মেধা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে পড়াশোনা চালায় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আইটি সেক্টর বা শিক্ষায় বিশেষ নজর দিতে হবে। আইটি বিশেষজ্ঞ বিদেশে রফতানী করে বছরে হাজারো কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। সারাবিশ্বে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এ সেক্টরের। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছি না আমরা। এখানে উল্লেখ্য, প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছেন সারাবিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আমাদের প্রবাসীরা। গার্মেন্টস শিল্পের বৈদেশিক আয়ের পরই এর স্থান। অথচ আশ্চর্য হলেও সত্য, এই প্রবাসীদের বেশীরভাগই আধা দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক। এদের অর্ধেকও যদি দক্ষ আইটি অপারেটর বা আইটি বিশেষজ্ঞ হতো, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয় আরো অনেক বেড়ে যেতো।

সর্বোপরি যে করেই হোক, যেভাবেই হোক, যতো দ্রুত সম্ভব একুশ শতকের উপযোগী একটি কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে আমাদের। যে শিক্ষা কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে না, কর্মের পথ প্রশস্ত করে না- সে শিক্ষা দিয়ে একটি দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। অতএব শুধু পদ্ধতিগত পরিবর্তন নয়, আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত আধুনিক, যুগোপযোগী ও কর্মমুখী।